পার্থসারথি

"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার মোক্ষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৬ তম বর্ষ)

(যুগ্ম : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / আন্তর্জাল আত্মা : এপ্রিল, ২০২০)

৭৪তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১ই জ্যৈষ্ঠ , ১৪৩৩ / 24.05.2026

-ঃ সম্পাদক ঃ-

সুনন্দন মোক্ষ

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

- সূচিপত্র -

(৭৪ তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্ম-কথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
আত্ম-জ্ঞান	শ্রী অনিলবরণ রায়
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি	ঘটোৎকচ
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু	শ্রী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতায় যোগী ও সন্ন্যাসী	শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দ
জগদলপুরের রূপকথা	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
জলকর	বাণীপ্রভা
হে অমিতাভ	শ্রী শান্তশীল দাশ
আমার আশ্রয়	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

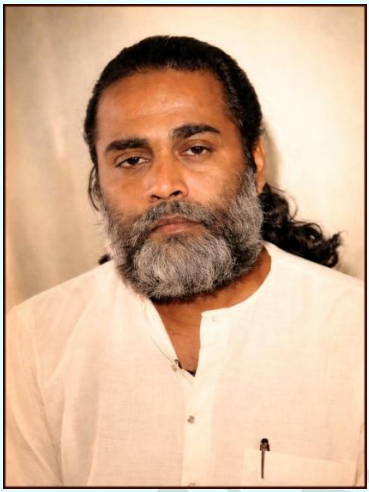

[১০.০৩.১৯২৬ – ২৪.১১.১৯৮৬]

প্রীতি-কণা

"সংসারের কর্তব্যকর্ম ঠিকভাবে না করে ঈশ্বর ঈশ্বর করবার কোন সার্থকতা নেই। সংসারের কর্তব্যকর্মের ভিতর দিয়ে নিজেকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে ও এর মধ্যে থেকে নিজেকে ঈশ্বরের হয়ে উঠতে হবে। সংসারকে ফাঁকি দিয়ে কোন কাজ করা আত্মপ্রবঞ্চনা করা ছাড়া আর কিছু নয়। ভালবাসা, প্রেম, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সংসারধর্ম পালন করতে হবে। নির্লিপ্ত ও আসক্তিশূন্য হয়ে এবং মনে প্রাণে এই ভাব রাখতে হবে যে এই সংসার ঈশ্বরের। তাঁর কর্ম করছি এই ভাব বজায় রাখতে হবে।"

১৯৯৩ সনের ২৪শে নভেম্বর এসে গেল। সাত বছর পূর্ণ হয়ে গেল শ্রীপ্রীতিকুমার তাঁর শরীর ত্যাগ করেছেন। মনে হয় এইতো সেদিন। বিকাল চারটের সময় আমার হাত থেকে চা চেয়ে খেলেন। সাড়ে চারটের মধ্যে সব শেষ। ক্ষতি আর কার কতটা হয়েছে আমার জানা নেই, আমার ক্ষতির কোনও ব্যাখ্যা চলে না। মাথার উপর স্বামী না থাকলে মেয়েদের যে কি অবস্থা হয় আমার থেকে কেউ ভালো জানে না, আবার বৃদ্ধকালে স্ত্রী বিয়োগ হলে ও বৃদ্ধদের যে কি অবস্থা তাও আমার বাবাকে দেখে বুঝেছি। অথচ এই চলে যাওয়াটা তো স্বতঃসিদ্ধ। আগের থেকে plan করে তো আর স্বামী স্ত্রীর একসাথে গত হবার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই এই একাকীত্বের যন্ত্রণা ভোগ করতেই হয়। এই কষ্ট ভোগ কোন মোহ, আসক্তি বা অভ্যাসের জন্য নয়। এই কষ্ট ভোগ নিজেকে অসহায় মনে করবার। তবু তো আমার কিশোরের মতো একটা ছেলে আছে, অনিমার মতো একটা বন্ধু আছে, শ্রীলার মতো একজন সমব্যথী আছে। যাদের সেরকমও না থাকে - তাদের কত দুঃখ!

শ্রীপ্রীতিকুমার নেই আমি এখনও মনে করি না। আমার শুধু সামনাসামনি কথা বলতে না পারার অসুবিধাটা মনে হয়। শুধু নিজের কথা বলে গেছি, অমন শ্রোতা আমি আর পাইনি জীবনে। যা ইচ্ছে প্রকাশ করেছি, মানবার চেষ্টা করেছেন। যদি কখনও জিজ্ঞেস করেছি – "আমি কি অন্যায় বললাম?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন- 'না'। বলেছেন "তোমার কথাতেই তো গুরুত্ব দিই।" যেটা পছন্দ হয়নি "না" বলে দিয়েছেন। শত চেষ্টাতেও টলানো যেতো না।

এ সংসারে যখন এসেছি সঙ্গে কোনও অর্থ সম্পদ, আসবাবপত্র ছিল না। এক এক করে প্রয়োজনানুযায়ী সামগ্রী কিনেছি। প্রতিটি জিনিষে মায়া আমার থাকতেই পারে কারণ বেশীর ভাগ সামগ্রী আমার চাকরী করা টাকা থেকে একসাথে নয়, এক এক করে কেনা। সে সব জিনিষ Maintain করবার মানসিকতা না দেখলে বাড়ীর অন্য সদস্যদের আমি সাবধান করে দিয়ে থাকি। এই ষাট বছর

বয়সে সমস্ত কিছু সামাল দেবার পর এটুকু interference-এর জন্য আমার কোনও লজ্জা নেই।

আমি স্নেহময় পিতার একমাত্র কন্যা ছিলাম। আর সেই পিতার দাবী ও ইচ্ছার উপর জোর দিয়ে আমি পড়াশুনা করেছি, জীবনে উপযুক্ত গৃহিনী হিসাবে সমস্ত সমস্যা মেনে নেবার চেষ্টা করেছি। আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানকার ভিতটা তো আমাকে তৈরী করতে হয়েছে। আমি যখন জন্মেছি, বিধাতাপুরুষ তখনই আমার ছকটা সাজিয়ে ফেলেছেন। আমার শুধু সেই ছকের ঘরে চলাফেরা। আর কাণ্ডারী বিহীন জীবনে সেই ছকে চলতে গিয়ে প্রতিপদে হোঁচট খাওয়া।

শ্রীপ্রীতিকুমার বলতেন- "একজন সুন্দরী মহিলার সামনে ঘণ্টার পর ঘন্টা বসে থাক, কোথা দিয়ে সময় কেটে যাবে বুঝতে পারবে না, অথচ আগুনের উপর এক সেকেণ্ড বসলে মনে হবে কয়েক বছর কেটে গেল।" আমি আজকাল পৃথকভাবে কাউকে চিঠি লিখি না। আত্মকথার মধ্য দিয়ে সকলে উত্তর পেয়ে যান। কিন্তু সবাই আমাকে চিঠি দেন। শুভেচ্ছা জানান। তাঁদের সকলের প্রতি আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে কটকের মঞ্জুদি ও কলকাতার শ্রীমতী স্মিতা চৌধুরীর প্রতি আমার বেশ ভালোবাসা জন্মেছে। ছুটিতে কত ভাবি কটকে মঞ্জুদির কাছে যাব অথবা দেরাদুনে রূপালীর কাছে। সবাই মিলে যাবার ব্যবস্থা হয় বলে আর ইচ্ছে মতো যাওয়া হয় না। নিজেকে একা মনে করলে কত দেশ দেখে ফেলতে পারতাম। কিন্তু কষ্ট হয়। আমি দেখবো আর আমার ছেলেটা দেখবে না। অগত্যা চলো চারজনেই যাই। বাচেন্দ্রী গত জুনমাস থেকে আমার কাছে শুচ্ছে। তারপর আর আমার কিশোরের বাড়ীতেও থাকা হয়নি। এবার কালী পূজার আগে একদিন কিশোরের কাছে থাকবার ইচ্ছে ছিল। মলি বারবার বলে "মামীমা কবে যাবেন?" যাব ভাবি কিন্তু যাওয়া আর হয় না। রাগ না হলে বোধহয় আর বেরোন হচ্ছে না। কিশোর আমার অবস্থাটা জানে, তাই এখন আর বেশী Request করে না। হয়ত

আমি দুদিন বাইরে থাকলে বাড়ীর লোকেরা স্বস্তি বোধ করবে। কিন্তু সব শান্তি কি আর সবাইকে ভগবান দেন!

অনেকে আমার কাছে বাচেন্দ্রীর কথা জানতে চান। বাচেন্দ্রী মোটামুটি বেশ পছন্দসই মেয়ে হয়েছে, কাউকে পরোয়া করে না। এক মিনিট অন্যমনস্ক হলেই হয় Electric-এর Plug নয়ত বঁটিতে হাত দিয়ে বসে থাকে। কটমট করে তাকালেই কান্না শুরু করে। "সোনা সোনা" বললে আবার চুপ করে। আমার আর আমার পুত্তরের মতো নধর কান্তি পায়নি। মামাবাড়ীর কাঠামোটা পেয়েছে মনে হয়। আমাদের সারাদিন ব্যস্ত রেখে দেয়। রাত্রে একটানা ঘুমোয় না। আবার রোজ সাড়ে ৩টা ৪টার মধ্যে ভোররাতে উঠে পড়ে। ফলে আমার ভোরবেলা ঘুমোবার একেবারেই উপায় নেই। আমি বাড়ী থাকলে যাদের দেরী করে বিছানা ছাড়বার সুখ ভোগ করা হয় না তাদের কন্যাই আমাকে শয্যা ত্যাগ করায়। তবু তো একটি শিশুতে মশগুল থাকার চেষ্টা করছি। প্রত্যেক মানুষেরই তো একটা অবলম্বন চাই। আমার স্বামী বলেছিলেন- "নাতি-নাতনীর জন্য কিছু করাতো ভাগ্যের ব্যাপার।" আমি সেই কথা মেনে চলবার চেষ্টা করছি মাত্র।

এবার পূজায় আমি মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে গেছিলাম। সে বর্ণনা অন্যবার, আজ আর নয়। পাঠকবর্গের প্রতি বিজয়ার শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই.....।

(** রচনাকাল – নভেম্বর, ১৯৯৩)

আমাদের প্রকৃত জীবন আমাদের নিজস্ব আত্মার মধ্যে। আমাদের বাহ্যিক জীবন আন্তরিক জীবনেরই এক প্রতিফলন, এক বিকাশন মাত্র। আমরা প্রতিবিম্বকেই প্রকৃত জীবন মনে করি, তাই আমরা নিয়ত মিথ্যার মধ্যে বাস করি।

আত্মাই সকল আনন্দের উৎস। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল এবং বাহ্যিক বস্তুসকল আমাদের আন্তরিক আনন্দকে বাইরে প্রকাশ করার একটা উপায় এবং উপলক্ষ মাত্র।

কিন্তু আমাদের অজ্ঞানতায় আমরা বাইরের দিকে ফিরি এবং আনন্দের বিফল সন্ধানে আমাদের ইন্দ্রিয়াদির অনুসরণ করি।

আমাদের আত্মাই সত্য জ্ঞানের উৎস। মনের কোন জ্ঞান নাই, সে কেবল অন্তর থেকে উৎসারিত আলোককে প্রতিবিম্বিত করতে পারে। তথাপি আমরা নিরন্তর আমাদের মনকে নিযুক্ত করি সত্যের সন্ধানে এবং তাই বাস করি ছায়া এবং অজ্ঞানতার মধ্যে।

আত্মাই সকল শক্তির উৎস, আমাদের দেহ আর মন আন্তরিক শক্তিকে বাইরে প্রকাশ করার পন্থা মাত্র। তথাপি আমরা আমাদের কাজের জন্য দৈহিক এবং মানসিক প্রচেষ্টার উপরই নির্ভর করি, সুতরাং আমাদের জীবন বৃথা এবং নিষ্ফল পরিশ্রমে ব্যয়িত হয়।

দিব্য জননীই আমাদের প্রকৃত আত্মা। আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশেই দিব্য জননীর সহিত আমাদের যথার্থ সম্বন্ধ। বাহ্যিক সম্বন্ধের উপর আমরা

অত্যধিক প্রাধান্য দিই, তাই দিব্য জননীর সহিত আমাদের সম্বন্ধের নিগূঢ় তত্ত্বটিই হারাই। দিব্য জননীর সহিত আমাদের আন্তরিক সম্বন্ধ যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আমাদের বাহ্যিক জীবন স্বতঃই সম্পূর্ণ, সুসঙ্গত এবং সুন্দর হয়ে উঠবে।

আমরাই আমাদের প্রকৃতির যথার্থ প্রভু। ঐ সত্যটি যতই আমরা উপলব্ধি করবো ততই নিম্নতর ক্রিয়াকর্ম আমাদের মধ্যে কমতে থাকবে এবং উচ্চতর গতিবিধি নিম্নতরের স্থান অধিকার করবে।

নিম্নপ্রকৃতি তার জালে আমাদিকে আবদ্ধ করে কারণ আমরা আমাদিকে আবদ্ধ করতে দিই। নিম্ন প্রকৃতির খেলায় আমরা রস গ্রহণ করি তাই ঐ খেলা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে থাকে। নিম্ন প্রকৃতির প্রেরণায় যতই আমরা সায় দিই ততই সে তার আধিপত্য অমোচনীয় ভাবে আমাদের উপর বিস্তৃত করে এবং আমাদিকে তার ক্রীতদাস রূপে ব্যবহার করে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করি সেই মুহূর্তে প্রকৃতি তার মুখোস অপসারিত করে এবং আমাদিকে তার প্রভুরূপে গ্রহণ করে।

নিম্নপ্রকৃতি এমন কোন প্রলোভনই আনতে পারে না যা আমরা দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত বর্জন করতে না পারি। এমন দুঃখ এমন বেদনা নাই যা আমরা সহ্য করতে না পারি। এমন কোন বিক্ষোভই আসতে পারে না যার মধ্যে আমরা শান্ত হয়ে থাকতে না পারি। এমন কোন অবস্থাই নাই, তা সে যতই নৈরাশ্যজনক বা মন্দ হউক না কেন, যার মধ্য থেকে আমরা স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে বেরিয়ে আসতে না পারি। অনন্ত এবং অদমনীয় শক্তি রয়েছে আমাদের আত্মার মধ্যে। আমাদিকে তা উপলব্ধি করতে হবে। নিম্নপ্রকৃতি তখন আমাদিকে বিব্রত করতে বিরত হবে। দিব্য জননীর

শরণাপন্ন হয়ে আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করি এবং যথার্থ শক্তি অর্জন করি। যতই আমরা তাঁর পায়ে উৎসর্গীকৃত হব ততই আমরা বুঝবো যে তিনিই আমাদের উর্দ্ধতর আত্মা, তাঁর শক্তিই আমাদের শক্তি, তাঁর প্রাণই আমাদের প্রাণ। তাঁর সহিত পরিপূর্ণ একত্বোপলব্ধিই হবে আমাদের সর্বোচ্চ বিজয় এবং আত্ম-সিদ্ধি।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি **ঘটোৎকচ**

ব্যাপক অর্থে এ জীবনের সাধনা – ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের সাধনা। ধর্ম আগে থাকিলেও অর্থ-কাম হইতে সাধনার শুরু। অর্থ-কাম অনর্থ যখন ঘটায় তখন ধর্ম উদ্ধার করে। তথাপি ধর্মে শেষ রক্ষা হয় না। অর্থাৎ পরিণামে 'মোক্ষ' চিন্তা না করিয়া উপায় নাই। এই মোক্ষ চিন্তাই বৌদ্ধ ধর্মের সারকথা। ইহার সহিত হিন্দু বা সনাতন ধর্মের কোন বিরোধ নাই। বিরোধ থাকিতে পারে না। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম মুলতঃ হিন্দুধর্মেরই একটা ভিন্নাবস্থা। গৌতমবুদ্ধ হিন্দু অবতারদের মধ্যে অন্যতম।

এইবার আসল বক্তব্যে আসিতেছি। 'মোক্ষ' বলিতে কি বুঝায়? মোক্ষের সাধনাই বা কেন? অল্প কথায় মোক্ষ শব্দের অর্থ - নির্বাণ বা চিরমুক্তি।

ত্রিবিধ দুঃখতাপে মনুষ্য জীবন জর্জরিত - আধিদৈবিক-আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক। দৈব হইতে ভয় আধিদৈবিক; ভূত হইতে ভয় আধিভৌতিক - আত্মার ভয় - আধ্যাত্মিক (spiritual)।

এই সংসার মায়াপ্রপঞ্চে কেহই সুখী নহে। কবি গাহেন-

"মহামায়ার ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

এহেন সংসারে 'জীৰ' কি করিবে? আপাত দৃষ্টিতে জীবের আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যাহার সৃষ্টিতে মানুষের হাত নাই তাহার ধ্বংসে তাহার অধিকার থাকিতে পারে না। অতএব আত্মহত্যা মহাপাপ। তাহা হইলে সংসারী থাকিয়াই মুক্তির উপায় খুঁজিতে হইবে।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়-
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়-
লভিব মুক্তির স্বাদ।" - (রবীন্দ্রনাথ)

ইহা কি করিয়া সম্ভব? আত্মসংযম আর আত্মত্যাগের মহত্বে। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য নাশে আত্মসংযম। আত্মসংযমের শক্তিতে আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগের মহত্বে পুনর্জন্মের নাগ পাশ হইতে মুক্তি বা মোক্ষ। আত্মত্যাগের মূল কোথায়? - মহাপ্রেমে। এই মহাপ্রেমের নাম অহিংসা- জীবসেবা- মৈত্রী। ইহারাই ভগবান বুদ্ধের অষ্টমার্গের বিখ্যাত ত্রয়ী। বুদ্ধদেব কোন নূতন ধর্ম প্রচলন করেন নাই, তাঁহার আন্দোলন ছিল সংস্কারমূলক। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম তিনটি আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত -

(১) পৃথিবীতে অশুভ আছে

(২) এই অশুভের কারণ কি?

(৩) নিবারণের উপায় কি?

নিঃস্বার্থপরতা বা আত্মত্যাগের দ্বারা সেই সহজাত 'অশুভ' কে নিবারণ করিতে হইবে। ময়লা দিয়া ময়লা ধোয়া যায় না। মনুষ্য জীবনে এই পথই নিত্যকালের পথ - নান্যপন্থাঃ। জীবই শিব। জীবের মঙ্গলেই শিবের মঙ্গল। অতএব শিবজ্ঞানে জীবসেবাই পরমার্থ। ঈশ্বরপ্রাপ্তি সাধারণ মানুষের কাম্য নহে। ঈশ্বরান্বেষণ বামন

হইয়া চাঁদ ধরার মতই পণ্ডশ্রম। এইখানেই বৌদ্ধ মতের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মমতের বিরোধ হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধদেবকে ভুল বুঝার যথার্থ কারণ নাই। তাঁহার এই নির্দেশ তলাইয়া দেখার মত। মৃত্যু-রহস্যের আজ পর্য্যন্ত যেমন কিনারা হয় নাই, তেমনি ঈশ্বর দর্শনেরও কোন মীমাংসা হয় নাই। মৃত্যু হইতেছে সেই অনাবিষ্কৃত দেশ যার প্রান্ত হইতে কোন পথিক আজও ফিরে নাই।

“Death is that undiscovered land
from whose bourn no traveler returns.” -- (Shakespeare)

সেইজন্য মৃত্যু রহস্যময়। ঈশ্বর দর্শন করিয়াছে কেউ জোর করিয়া বলিতে পারেনা বা অপরকে দেখাইতে পারিবে তেমন দুঃসাহসও নাই। গতিকে ঈশ্বরও রহস্যাবৃত!

প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে তবে কি বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন। না, তাহাও নহে। ব্যাখ্যার দোষেই হউক আর অজ্ঞতার অভিশাপেই হউক বুদ্ধবাণীর মর্ম ভারতে উপলব্ধ হয় নাই। বিবেকানন্দ যেভাবে বুদ্ধদেবকে সমর্থন করিয়াছেন, সেভাবে মনীষীদের মধ্যে আর কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না। স্বামীজী বলিয়াছেন ঈশ্বরালোচনা হইতে বিরত থাকার নাম ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করা নহে। বৌদ্ধধর্মের কোন অন্ধকার দিক নাই। বৌদ্ধধর্ম নাস্তিকতা শিক্ষা দেয় না। বিবেকানন্দের নিজের কথা দিয়াই শেষ করি, “বুদ্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি কাহারও নিন্দা করেন নাই, নিজের জন্য কিছু দাবী করেন নাই। নিজেদের চেষ্টাতেই আমাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। মৃত্যু শয্যায় তিনি বলিয়াছিলেন, আমি বা অপর কেহই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না। কাহারও উপর নির্ভর করিও না। নিজের মুক্তি নিজেই সম্পাদন কর।”

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু **শ্রী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়**

১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিসে এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। আর সেই উপলক্ষে পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনেরও অধিবেশন হচ্ছে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সেই সম্মেলনে এসেছেন তাঁদের নিজের নিজের গবেষণার কথা জানাতে। সেই সঙ্গে দেশবিদেশের নানা গুণীজ্ঞানীও সেখানে সমবেত হয়েছেন। আমাদের দেশের বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত আছেন। স্বামীজী দেখছেন- জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালীয় বিজ্ঞানীরা একে একে এসে নিজের গবেষণার কথা শুনিয়ে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করলেন। কিন্তু তাঁর জন্মভূমি ভারত; বঙ্গভূমি কোথায়? কে তার নাম নেয়? কে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? স্বামীজী গভীর মর্মবেদনা অনুভব করলেন।

স্বামীজীর মনে পড়লো ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা যখন দেশ-দেশান্তর থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জনের জন্যে এদেশে আসত, যখন কণাদ, আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, নাগার্জুন, চরক, সুশ্রুত প্রমুখ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারপর? তারপর এলো এক অন্ধকার যুগ। অপর দেশের কাছ থেকে ভারত তখন দুহাত ভরে বিজ্ঞানের দান শুধু গ্রহণই করে চলেছে, বিজ্ঞান জগতে তার নিজস্ব কিছু দেবার নেই।।

স্বদেশের এই দৈন্যের কথা ভেবে স্বামীজীর মন যখন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, এমন সময় তিনি দেখলেন যে গৌরবর্ণ বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে এক যুবা

যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন - সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস।

বস্তুত, আচার্য জগদীশচন্দ্রই প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী, যিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীসমাজে দেখালেন - ভারত শুধু অপরের কাছ থেকে গ্রহণই করে না. তার নিজস্ব কিছু দেবারও আছে।

জগদীশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক জীবনের সূচনা হয়েছিল ছাত্রাবস্থাতেই। জগদীশচন্দ্র তখন পূর্ব বাংলার ফরিদপুরে বাংলা স্কুলে পড়েন। স্কুলে যাওয়া আসার পথের ধারে গাছপালা বন-জঙ্গল। একদিন তাঁর এক সহপাঠী তাঁকে বললে - গাছের একটা ম্যাজিক দেখবি? বলে পথের ধারে একটা লজ্জাবতী লতাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিল। দেখতে দেখতে গাছের পাতা কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল।

ব্যাপারটা দেখে বালক জগদীশচন্দ্র অবাক হয়ে গেলেন - কই, আর কোনো গাছ ছুঁলে তো এমন হয় না। তাঁর মনে কৌতূহল সৃষ্টি হলো। সেদিন তিনি এর কোনো কারণ বুঝে উঠতে পারেন নি। কিন্তু পরে বড় হয়ে তিনি নিজেই পরীক্ষার দ্বারা এর কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন - মানুষের মতো গাছপালাও সুখদুঃখ বেদনা অনুভব করে।

শুধু গাছপালাই নয়, জগদীশচন্দ্র দেখিয়েছিলেন বাইরের উত্তেজনায় একখণ্ড তামা, একটি গাছের ডগা ও একটি ব্যাঙের পেশী একই ভাবে সাড়া দেয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে তাদের এই সাড়া লিপিবদ্ধ করা যায়।

জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর নিজের তৈরী সাড়ালিপি যন্ত্রের সাহায্যে পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর আবিষ্কার পরীক্ষা করে দেখান, তখন তাঁদের

বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তাঁরা প্রথমে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে সত্য বলে স্বীকার করতে চান নি। এমন কি তাঁদের একজন জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কারকে নিজের বলে চালাবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রই জয়ী হন।

উদ্ভিদ সম্পর্কে এই আবিষ্কারের আগে জগদীশচন্দ্রের আর একটি আবিষ্কারও বিজ্ঞানজগতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আবিষ্কারটি হচ্ছে বিনাতারে বার্তা বা সংকেত প্রেরণ সম্পর্কে। বিনাতারে বার্তা পাঠাবার এক অভিনব যন্ত্র তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। আমরা জানি, বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে বিনাতারে বার্তা পাঠানো হয়। এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ইটপাথর ভেদ করে অনেকদুর পর্যন্ত যেতে পারে, দূরে বারুদের স্তূপে আগুন ধরাতে পারে।

১৮৯৫ সালের কলকাতার টাউন হলে বাংলার তদনীন্তন গর্ভনর সার উইলিয়ম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে জগদীশচন্দ্র তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে বিনাতারে বার্তা প্রেরণের পরীক্ষা দেখান। তাঁর যন্ত্রে উৎপন্ন বিদ্যুৎ তরঙ্গ দুটি বন্ধ ঘর ভেদ করে ৭৫ ফুট দূরে তৃতীয় ঘরে পৌঁছলো, সেখানে একটা লোহার গোলা ফেলে দিল, পিস্তলে আওয়াজ করলো ও বারুদ স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিল। বেতারযন্ত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনীকে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মার্কনী এ বিষয়ে পরীক্ষা করার আগেই জগদীশচন্দ্র বিনাতারে বার্তা প্রেরণের পরীক্ষা দেখিয়েছিলেন। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র যে মার্কনীর পূর্বাগত তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। তবে জগদীশচন্দ্র তাঁর বেতার যন্ত্রের পেটেন্ট গ্রহণ করেন নি, কিন্তু মার্কনী ১৮৯৬ সালে তাঁর বেতার টেলিগ্রাফের পেটেন্ট গ্রহণ করেন।

জগদীশচন্দ্রকে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠার জন্যে বিদেশে নানা বাধাবিপত্তির

সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এজন্যে তাঁর মনে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল - এদেশে এমন একটি বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করতে হবে, যেখানে এদেশের বিজ্ঞানীরা মৌলিক গবেষণার সব রকম সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর তিনি বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই ৩০শে নভেম্বর তাঁর জন্মদিনও।

এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বলেছিলেন- 'ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞানমন্দির দেবচরণে নিবেদন করিলাম।' তিনি চেয়েছিলেন - শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর সর্ব জাতির সকল নরনারীর জন্যে এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকবে।

এই বিজ্ঞানমন্দিরের পরিকল্পনায় ও প্রতিষ্ঠায় একজন মহীয়সী নারী ও একজন মহাপ্রাণ কবির প্রেরণা ও সহযোগিতা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁদের একজন হলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং অপরজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। জগদীশচন্দ্রের সকল কর্মে ও সকল উদ্যোগে প্রেরণাদাত্রী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। বিজ্ঞানজগতে জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠায় এই মহীয়সী নারী যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, তেমনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিকল্পনায় তাঁর প্রেরণাময় স্পর্শ অনুভব করা যায় ছত্রে ছত্রে। জগদীশচন্দ্রও এই প্রেরণাদাত্রী মহীয়সী নারীর প্রতি তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা চির-অক্ষয় করে রেখে গেছেন। বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশ পথে প্রাচীর গাত্রে- কল্যাণ দীপ হস্তে যে নারীমূর্তি ক্ষোদিত আছে তা ভগিনী নিবেদিতারই ভাবমূর্তি। মন্দির শীর্ষে যে বজ্রের প্রতীকটি আছে সেটিও ভগিনী নিবেদিতার পরিকল্পিত।

ভগিনী নিবেদিতার মতো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও বৈজ্ঞানিক সমাজে জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠায় ও বসুবিজ্ঞান মন্দিরের নির্মাণকল্পে সর্বতোভাবে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসেন। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথা তিনি বাংলায় লিখে প্রচার করেন। ১৯২৮ সালে দেশবাসীর পক্ষ থেকে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসবের যে আয়োজন করা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রণী। সেই উপলক্ষে রচিত একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন -

'তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে
নিভৃত নিরালা বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ,
সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে করি-হাতে
বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যখানি পরে।'

জগদীশচন্দ্র তাঁর উত্তরে বলেছিলেন – 'আমার সমুদয় চেষ্টার মধ্যে আমি কখনও সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম না। আমরা উভয়েই যখন অপ্রসিদ্ধ ছিলাম, তখন আমার চিরবন্ধু রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ছিলেন। সেই সব সংশয়ের দিনেও তাঁহার বিশ্বাস কখনও টলে নাই।'

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হলেও সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে কখনও পৃথক করে দেখেন নি। তাঁর এই সাহিত্যপ্রীতির জন্যে তিনি একাধিকবার বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি পদে বৃত হন। তিনি যে 'অব্যক্ত' গ্রন্থখানি রচনা করে গেছেন তা বাংলা সাহিত্যে চিরদিন অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশে বলেছিলেন – 'যদিও বিজ্ঞান- বাণীকেই

তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্য-সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত।'

দেশের প্রতি জগদীশচন্দ্রের ছিল গভীর অনুরাগ। ভারতবর্ষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্বগরিমায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর সঞ্চিত সমস্ত অর্থই এই মন্দির নির্মাণের জন্যে দান করেন। অপূর্ব কারুকার্যময় এই বিজ্ঞান-মন্দিরটি পরিদর্শন করলে দেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্রের অন্তরাকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রকাশ নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

গীতায় যোগী ও সন্ন্যাসী **শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দ**

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"- গীতা ২/৪৭

যোগ শব্দের অর্থ অভিধান বলে যুক্ত করা, ঐক্যবদ্ধ করা, মিলন ও সংযোজনা ইত্যাদি। তন্মধ্যে পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"। গীতার নামান্তর যোগশাস্ত্র এবং আঠার অধ্যায়ের প্রত্যেকটি অধ্যায় এক এক যোগ, যেমন কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ, ভক্তিযোগ, মোক্ষযোগ ইত্যাদি। গীতার প্রতিটি অধ্যায়ের যাহা প্রতিপাদ্য তাহার চরম লভ্য ভগবান হওয়ায় ভগবানের সহিত যোগ কারক যাহা কিছু সবই যোগ। ভগবানকে লাভ করিবার প্রধান তিনটি উপায়, ভাগবতের মতে - জ্ঞানযোগ কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ। আন্তরিক বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষু ব্যক্তির অনিত্য গৃহ, পরিজন ও সাংসারিক কর্মাদি ত্যাগের নাম সন্ন্যাস অর্থাৎ সম্যক প্রকারে ন্যাস।

'ভিক্ষুকোপনিষদ' অনুসারে কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংসাদি ভেদে সন্ন্যাসাশ্রমের পরস্পর কিছু কিছু পার্থক্য আছে। একনিষ্ঠ ভগবদ্‌ভক্তগণের মতে সৎ অর্থাৎ নিত্য শাশ্বত ভগবানের নিকট সকল বিষয়ের অর্পণই সন্ন্যাস। ভগবানকে অর্পিত মাল্য চন্দন বস্ত্র অলঙ্কার ও অন্নাদি ভোগে তাঁহাদের সন্ন্যাসের হানি হয় না পরন্তু দুরত্যয়া মায়াকে জয় করা যায় – "ত্বয়োপভুক্ত-ত্রগ্-গন্ধ-বাসোহলঙ্কার চর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি"- (শ্রীমদ্ভাগবত-১১.৬.৪৬)। ভক্তের ঈশ্বরার্পিত বস্তুর ভোগ নামে ভোগ বটে কিন্তু ইহা যুক্ত বৈরাগ্য আর বন্ধন কারক মনে করিয়া ঈশ্বরার্পিত বস্তুর ত্যাগ ফল্গু বৈরাগ্য।

যদিও যোগশাস্ত্র গীতায় প্রত্যেক অধ্যায় একটি যোগ তথাপি গীতা কাহাকে প্রকৃত যোগী বলেন এবং গীতার মতে সন্ন্যাসী কে তাহাই বর্তমান এই প্রবন্ধের আলোচ্য। পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে দ্বাপরযুগের শেষে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে ভগবান পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে যে গীতা বাণী মহামৃত বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য ক্ষরিত হইয়াছিল তাহাতে পূর্ব্ব প্রচারিত অধ্যাত্মবাদের কোনও কোনও সিদ্ধান্তের হইতে পৃথক বৈপ্লবিক অথচ সরল বাস্তব ও বিশিষ্ট অভিব্যক্তি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাচীন ভারতের প্রকাশিত পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের বেদবাদ বা কর্মবাদ, সাংখ্য দর্শনের পুরুষ প্রকৃতি-বিবেকবাদ এবং বেদান্তদর্শনের ব্রহ্মবাদের মধ্যে পার্থক্য যুক্ত অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি জটিল দার্শনিক মতবাদের গহন অরণ্যে প্রবেশ না করিয়া অথচ প্রত্যেক মতবাদের ভাল ভাল তত্ত্ব স্বীকার করিয়া তাহার প্রত্যেকটির সহিত নিজেকে মুখ্যভাবে সংযুক্ত রাখিয়া ভগবান গীতায় কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও মোক্ষ – চতুরঙ্গ যোগরূপ এক অপূর্ব সত্যবাদ ঘোষণা করিলেন। তাহাই গীতার সম্পূর্ণ নিজস্ব মত।

বিশ্বজনীন এই মতে পরস্পর কলহ নাই, আছে সমন্বয়, সামঞ্জস্য, যুক্তি, প্রশান্তি ও পরিপূর্ণতা। পূর্বমীমাংসার যাগ যজ্ঞাদি কর্ম ফলাকাঙ্খা ও কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত এবং ঈশ্বর প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া মোক্ষদায়ক হইল। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইল বটে কিন্তু অনাদি পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই ঈশ্বরের শক্তি ও তাঁহার অধীন বলিয়া ঘোষিত হইল। যোগদর্শনের মধ্যে গৌণভাবে স্বীকৃত ঈশ্বর সর্বপ্রধান ও পরিপূর্ণভাবে ভাবে স্থাপিত হইলেন এবং তৎসহ যজ্ঞ নিয়ম ধ্যানাদি অঙ্গ যজ্ঞাকৃত হইল। উপনিষদের "যদ্‌হরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রবজেৎ", "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে বেদান্ত জ্ঞানবাদী সন্ন্যাসিগণ যাঁহাদের মতে কর্ম মোক্ষপ্রদ না হওয়ায় কর্মত্যাগই একমাত্র মোক্ষলাভের উপায় এবং সন্ন্যাস ভিন্ন জ্ঞান বা মুক্তি হওয়া অসম্ভব তাঁহাদের এই প্রচলিত মতের সংশোধন সাধিত হইল।

নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে ভগবান অর্জুনকে জ্ঞানযোগের প্রশংসা মধ্যে মধ্যে শুনাইয়াছেন – "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" ইহাতে সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন করাই কর্ত্তব্য বুঝা যায়। সুতরাং গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জুনের প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক।

অর্জুন বলিলেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি সন্ন্যাস বা কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ এই দুই কথা আমাকে বলিতেছ। এই দুইটির মধ্যে আমার পক্ষে যেটি মঙ্গলপ্রদ তাহা নিশ্চয় করিয়া বল।" তদুত্তরে ভগবান যাহা ব্যক্ত করিলেন তাহা কেবল ভারতের নয় বিশ্বের ঈশ্বরবিশ্বাসী ও জনমঙ্গল বিষয়ে চিন্তাশীল সৎকর্মপ্রিয় সজ্জনগণের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী ও প্রেরণাপ্রদ এক অভূতপূর্ব অভিনব সংবাদ এবং বিশ্বধর্মের ইতিহাসে ইহা পুণ্যভূমি

ভারতবর্ষের এক অনুপম সংযোজন। ভগবান বলিলেন যে, কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ এই দুইই মোক্ষপ্রদ বটে, কিন্তু কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেয়ান্। সংসার-আশ্রম ও সর্বকর্ম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সংসারে থাকিয়াও যিনি রাগবিদ্বেষ মুক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। পণ্ডিতগণ কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগকে ভিন্ন বলেন না অজ্ঞ ব্যক্তিই পৃথক বলেন। এই উভয়ের যে কোনও একটি করিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। তবে এই স্থলে বিশেষ লক্ষ্য করার একটি অত্যাবশ্যক কথা এই যে অগ্রে কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করিয়াই যিনি কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী সাজেন তাঁহাকে বহু দুঃখ পাইতে হয়, পরন্তু কর্মযোগের অনুষ্ঠাতা অচিরেই মুক্তিলাভ করেন। আর বিশুদ্ধমনা সংযত দেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং নিজের মধ্যে ও সর্বভূতে একাত্মদর্শী কর্মযোগী কর্ম করিয়াও কর্মে লিপ্ত হন না। কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্তৃত্বাভিমান শূন্য কর্মযোগী যে নিষ্কাম কর্ম করেন তাহা বিশ্ব-মঙ্গল কর্ম। কর্মাসক্তি রহিত ও পরিপূর্ণ নিত্য শাশ্বত বস্তু ভগবান ও সৎকর্মের আদর্শ প্রদর্শন ও জগৎ-কল্যাণের জন্য এই পৃথিবীতে কার্য করেন। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের পূর্ব পর্য্যন্ত ভগবান কর্মযোগ ও কর্ম সন্ন্যাস সম্পর্কে যাহা যাহা বলিয়াছেন, ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম দুই শ্লোকে তাহাই আবার দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিলেন যাহাতে লেশমাত্র সংশয়ের অবকাশ না থাকে। যুগান্তরকারী এই দুইটি শ্লোক-

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ৬/১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥" ৬/২

পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত ধ্যানযোগের বিশদ আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান করিয়াছেন। কিন্তু কর্মযোগের অঙ্গই এই ধ্যানযোগ। কারণ কর্মযোগের মূলকথা

কর্মফল ত্যাগ, কামনা ত্যাগ এবং তজ্জনিত সমচিত্ততা ও প্রশান্তি এবং ইহাদের লাভের উপায় ধ্যানযোগ। ভগবান কহিলেন যে, কর্মফলের আশা না করিয়া যিনি নিজ কর্তব্য করেন তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী এবং তিনিই যথার্থ কর্মযোগী ও ধ্যানযোগী। আশ্রমোচিত যজ্ঞাদি শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশধারী হইয়া ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করিলেই যথার্থ সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আর সর্বাধিক দৈহিক কর্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে বসিয়া থাকিলেই যোগী হওয়া যায় না। কেবল বাহিরের ত্যাগ নহে ভিতরের ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ, তাহার সহিত বাহিরের ত্যাগের যোগ থাকিলেও ক্ষতি নাই, না থাকিলেও ক্ষতি নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী কর্মযোগী সন্ন্যাস ও ধ্যানযোগের ফল যে সমচিত্ততা ও চিত্তপ্রশান্তি তাহা লাভ করেন। সন্ন্যাসের মূল রহস্য কর্মফলের কামনা ত্যাগ, কিন্তু কদাচ কর্ত্তব্য-কর্ম ত্যাগ নহে। ধ্যানযোগের মূল রহস্য সঙ্কল্প ত্যাগ, কামনা ত্যাগ, কেবল শরীরের নিষ্ক্রিয়তা নহে। কারণ ফল কামনা বা সঙ্কল্প চিত্ত-বিক্ষেপের হেতু। কর্মযোগেরও মূল রহস্য ফলকামনা ত্যাগ। অতএব কর্মযোগ, ধ্যানযোগ ও সন্ন্যাস এই তিনই গীতার সিদ্ধান্তে একই, যেহেতু এই তিনের মূল কথা কামনা ত্যাগ। গীতার মতে ধ্যানযোগ কর্মযোগের অঙ্গ। নিষ্কাম কর্মে ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিমান বা অহং ত্যাগে আত্মশোধন দ্বারা ব্রাহ্মী-স্থিতি লাভে চিত্তের প্রসাদ ও প্রশান্তি আসে। সাম্যবুদ্ধিতে সর্বভূতে নারায়ণকে দর্শন করিয়া যিনি সর্বভূতের সম্মান করেন, পর্বত-গুহায়, অরণ্যে বা গৃহে তিনি যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, যে বেশ ধারণ করুন না কেন তিনিই যোগী এবং সর্বদা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত।

কর্মফলের লোভেই মনের বিক্ষেপ আসে এবং কর্মযোগী ও ধ্যানযোগী উভয়েরই চিত্ত চাঞ্চল্যমুক্ত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সন্ন্যাসী শব্দের ব্যাপক অর্থ

ত্যাগী, এইজন্য চিত্তবিক্ষেপ ত্যাগীই প্রকৃত সন্ন্যাসী, কেবল কর্মত্যাগ সন্ন্যাসীর পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। সন্ন্যাসী হইতে হয় মনে, কেবল কর্মত্যাগে বা ভেকে নহে। গৃহাশ্রমে কর্মানুষ্ঠান নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ ও দুঃখপ্রদ বলিয়া সন্ন্যাসী হওয়ার যোগ্যতালাভের পূর্বেই অনেকে বৈরাগী বা সন্ন্যাসী সাজে। তাহাতে মনের মধ্যে ভোগবাসনা ও কর্মফলের কামনার নিবৃত্তি না হওয়ায় তাহার ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে ও মঠ মন্দিরাদিতে নানা উপদ্রব ও অশান্তি ঘটে। তাই আমাদের আর্য্যশাস্ত্র বলেন –

"বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনাং গৃহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয়ানিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥

প্রখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রকার মনু বলিয়াছেন 'ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্' অর্থাৎ কেবল কোনও বেশভূষা, বিশেষ চিহ্ন, দণ্ড, বেশ ইত্যাদি ধারণ ধর্মের প্রমাণ নহে। মানুষের মনের পবিত্রতা, চরিত্রশুদ্ধি এবং সকলের প্রতি মৈত্রীভাবনা ও সকলের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন প্রভৃতি ধর্মের কারণ। "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্তৈ নির্বিষয়ং মনঃ ।।" (উপনিষদ)
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীল রঘুনাথ দাসকে অনাসক্ত হইয়া গৃহাশ্রমে থাকিতে এবং মর্কট বৈরাগ্য ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। "মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞ্যা।" (চৈ.চ.)। অপরের দ্রব্য কোন্ সুযোগে গ্রহণ করিবে মনে এই কথা চিন্তা করিয়া অথচ নিষ্ক্রিয় হইয়া বানর নির্লোভের ভাব দেখায় তাহাই মর্কট বৈরাগ্য। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু সাধু সজ্জন ছিলেন বা আছেন যাঁহারা সন্ন্যাসীর সাজ পরিয়া গৃহত্যাগ করেন নাই অথচ সমগ্র জীবন ঈশ্বর ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ফলকামনাহীন ও কর্তৃত্বাভিমান শূন্য মনে অনাসক্তভাবে জনসেবাকে নারায়ণসেবা জ্ঞানে বিরাট কর্ম-যোগের মহাজীবন যাপন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহারাই গীতার সন্ন্যাসী ও ধ্যানযোগী।

তাঁহাদের শ্রীচরণে সহস্র প্রণিপাত। এই ক্ষুদ্র লেখক নিজ জীবনে এক বিরাট কর্মযোগী, ঈশ্বর প্রেমিক ও জগদ্ধিতকারী মহাপুরুষ পরম পূজ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর সম্প্রতি নিত্যধামগত স্বামী শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের নিকট হইতে গীতার উক্ত মর্মবাণীর প্রকাশক যে পত্র লাভে ধন্য হইয়াছিল নিম্নে তাহার কিয়দংশ দিতেছি-

"তুমি সন্ন্যাসের জন্য ব্যাকুল হইয়াছ ইহা আশ্চর্য্য নহে। কাষায় বসনের নিশ্চয়ই একটা মূল্য আছে। তোমার আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসের প্রয়োজন কি? বাহিরের লোকের কাছে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় না দিলে কি ক্ষতিটা হইবে? নিজেকে সন্ন্যাসী জানিয়া অনাসক্ত হও। চারিদিকে অজ্ঞান মেঘাচ্ছন্ন মানুষগুলির অন্তরে জ্ঞানের আলো, মুক্তির আলো, বুদ্ধির আলো ও সাধনের আলো বিতরণ কর। গেরুয়াহীন সন্ন্যাসী বলিয়া নিজেকে জানিয়া বিজ্ঞাপন বর্জিত সন্ন্যাসজীবন যাপন করা আরম্ভ কর। শরীর থাকিতে থাকিতে একান্তই ঈশ্বরানুগত হইবার আকুতি লইয়া পথ চল ..... ইত্যাদি।

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ । গীঃ ১৮/২
ত্যাজং দোষবদিত্যেকেকর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে। ১৮/৩
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাৱনানি মনীষিণাম্ ॥ ১৮/৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম ॥" গীঃ ১৮/৬
ওঁ তৎসৎ শ্রীকৃষ্ণার্পনমস্তু

প্রথমেই বলে রাখা ভালো চেটেপুটে জগদলপুরের জন্য আমরা কিন্তু জগদলপুরে যাইনি। কথাটা অদ্ভুত শোনাতে পারে, আসলে কাঙ্গের ভ্যালির জঙ্গল সহ দন্তেওয়ারার দন্তেশ্বরী মন্দির আর কুটুমসর গুহা দেখার সাথে এখানকার জলপ্রপাতে যদি গা ভাসাতে চাই তাহলে শুধু তিনটে দিন হাতে রাখলেই চলেনা, আসতে হয় ১লা নভেম্বর থেকে ৩০শে জুনের মধ্যে। বাকি সময় ন্যাশনাল পার্ক তো বন্ধই, এমন কি বর্ষার গুহায় গা গলালে জোঁকের জ্বালায় জ্বলতে হতে পারে। তবু যে ১৬ থেকে ২১শে আগস্ট আমাদের বর্ষা অভিসার তার প্রধান কারণ ভারতের নায়েগ্রা চিত্রকূটকে তার ভরা যৌবনে প্রত্যক্ষ করা। তার সাথে কাঙ্গের জঙ্গলের তিরথগড় সহ আরো কিছু ঝরণা যে ঝরবেই তা নিশ্চিত জানতাম। সময়টা যে বর্ষাকাল!

হাওড়ার ২০ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ১৮০০৫ সম্বলেশ্বরী রাত ১০টা ২০তে ছাড়ার আগেই যদি ডিনারটা হয়ে যায় তাহলে ট্রেন ছাড়ার পর কম্বল বিছানো ছাড়া করার কিছু থাকেনা। তারপর রাউরকেলায় ঘুমভাঙ্গা চোখে জানলার পাশে বসে দেখতে পাই বৃষ্টিভেজা সম্বলপুর পৌঁছাবার পথে ৫৪ জনের বগিতে যাত্রী সংখ্যা কমে কিভাবে দশ হয়ে গেল। এ পথে নাকি এটাই দস্তুর। এমনকি শেষ বিকেলে কোরাপুটের পর সারা বগিতে যাত্রী বলতে যে আমরা দু'জন হয়ে যাব এটাও এখানে আশ্চর্য্যের নয়। চমকটা ছিল বেলের রাস্তায়। থেরুবালিতেই আভাস পেয়েছিলাম, কিন্তু রূপরাজ্যের দ্বার খুলে গেল রায়াগাদা থেকে কোরাপুটের যাত্রাপথে। শুধু ৩৬টা টানেল, ৭৬টা ব্রিজ আর ১৮০ টা বাঁকের জন্যই বলছি না, সমস্ত রেলপথের দু' পাশ যেন সবুজে বিছানো কার্পেট! সবুজ পাহাড়েরা যেন সবুজ গ্যালারিরূপে

আমাদের চারপাশে, মাঝখানে চলছে দুরন্ত রেলের ড্রিবলিং। কখনো পাহাড় যেন সবুজ কচ্ছপের পিঠ কখনো বা সে সবুজ ভোলানাথ। কখনো দুই পাহাড়ের খাঁজে দেখেছি রমণী দেহের ইঙ্গিত। আবার পুরু সাদা মেঘকেও বাঁধা পড়তে দেখেছি সেই দেহের বুকের খাঁজে। যে রূপই দেখিনা কেন এ যেন এক সবুজ রাজার দেশ!

১৭ তারিখে রাত দশটায় জগদলপুর পৌঁছাবার কথা থাকলেও দেড় ঘন্টার বেশি দেরী করে ট্রেন শেষ পর্যন্ত পৌঁছালো রাত ১১ টা ৪০-এ। স্টেশনে অটো ছিল, 'হোটেল অতিথি'ও পাঁচশো মিটারের বেশি দূরে নয়, তবু হাঁকডাকে হোটেলের দরজা খুলিয়ে যখন ঘুমের দরজায় তখন রাত পৌনে একটা।

পরদিন সকালে ক্লান্ত শরীরটা ঘুমাতে চাইলেও শরীরের অ্যালার্ম তাকে জাগিয়ে দিল সকাল ঠিক পাঁচটায়। ইতিমধ্যে তেওয়ারি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের 'গুডমর্নিং' মোবাইলে এসে গেছে। তখনই দীপক তেওয়ারির সাথে কথা বলে ঠিক করে নিলাম ড্রাইভার সমেত টয়োটো গ্লানজা চলে আসবে সকাল আটটার আগেই। ইতিমধ্যে হোটেলের উল্টোদিকের দোকানে তিতকুটে চায়ে ঘুমটাকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে স্নান আর ব্রেকফাস্ট সেরে যখন আমরা অতিথির দরজায়, দীপক ভাই ততক্ষণে স্বয়ং তার পারফেক্ট টাইমিং দেখিয়ে দিয়েছে।

বস্তারের ভঞ্জ রাজবাড়ির গৃহদেবতা দন্তেশ্বরীর মন্দিরে প্রণাম না করে দীপকভাই কখনো সফর শুরু করেনা, তাই আজকের প্রথম পয়েন্ট ছিল দু' কিলোমিটার দূরের এই দন্তেশ্বরী মন্দির। আসল মাতার মন্দির, যেখানে সতীর দাঁত পড়েছিল বলে বিশ্বাস, সে এখান থেকে প্রায় ৮৬ কিলোমিটার দূরে দন্তেওয়ারায়। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য রাজবাড়ির মন্দিরেই দেবী দর্শন করে তুষ্ট। আসলে দেবতা

রয়েছে আমাদের বিশ্বাসে। সে যাই হোক, মন্দিরের সাথে রাজ প্রাসাদেও ঢুঁ মারা আজকেই হয়ে যেত যদি ঘড়ির কাঁটা দশটাকে ছুঁয়ে ফেলত। তার আগে প্রাসাদে প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে চলে আসি পরের দ্রষ্টব্য মোতিতালাও অঞ্চলে ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরে। দক্ষিণী শৈলীর এই মন্দিরে নেই কোন পাণ্ডার উৎপাত অথবা ভক্তের ঠেলাঠেলি। টিপটিপ বরষার পানিও 'বালাজি মন্দির' নামে পরিচিত মন্দিরে ভগবান বিষ্ণু দর্শনে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। শুধু সারাই-এর কাজ চলছে বলে মনপসন্দ ছবি নেওয়া গেলনা, এই যা!

গুগল বৃষ্টির সম্ভাবনা যেদিন প্রবল বলে জানিয়েছে, ইলশেগুড়ি সেদিন হঠাৎ ঝরনা হয়ে ঝরতেই পারে। তাই 'আর বিলম্ব নয়' বলে গাড়ি ছুটলো ভারতের নায়েগ্রা চিত্রকূট জল প্রপাতের দিকে। স্টেশন থেকে চিত্রকূট ৪৫ কিলোমিটার হলেও বালাজি মন্দির থেকে সেটা ৩৭-৩৮ এর বেশি হবেনা।

৫০ টাকার টিকিটে প্রপাতে প্রবেশাধিকার মিলতেই ভি.আই.পি. পথ ধরে গাড়ি একেবারে চিত্রকূটের দরজায়। ভাগ্যিস সাত সকালে - নাহলে পায়ে দলতে হতো অন্তত ৫০০ মিটার। তাতেও কি আশ মিটিয়ে চিত্রকূটকে বন্দি করতে পারতাম - মনে অথবা ক্যামেরায়? সকালের গন্ধ এখনো যায়নি বলেই হয়তো ভিউ পয়েন্টগুলো এখনো ফাঁকা। কিভাবে ভাবে বর্ণনা করব এই উন্মাদিনীকে? ৯৮০ ফুট বিস্তারিত ইন্দ্রাবতী যখন বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে ৯৫ ফুট ঝাঁপিয়ে অসংখ্য জলকণায় আকাশ ভরিয়ে দেয়, যখন সেই জলকণায় বিচ্ছুরিত হয় সাত রঙের খেলা- তখন লিখব কি, স্তম্ভিত হয়ে দেখা ছাড়া করার কিছু থাকেনা। নভেম্বরে পাগলিনী একটু শান্ত হলে নীচের জলাধারায় নেওয়া যায় বোটিং-এর রোমাঞ্চ। আগস্টের আঠারোতে সে চেষ্টা মানে মরণের সাথে খেলা করা। তাই বন্ধও থাকে বোটিং উৎসব। এখন

শুধুই তাকিয়ে তাকা আর নীচে নেমে দেখার চেষ্টা, ইন্দ্রাবতীর মিলনাকাঙ্খা কেমন ডাইনে বাঁক নিয়ে ছুটেছে গোদাবরীর সাথে একাকার হবে বলে। প্রসঙ্গত বলে রাখি আমরা থাকতে পারিনি বটে, চিত্রকূটের 'দনদমি লাক্সারি রিসর্টের' অভিজ্ঞতা কিন্তু লা জবাব।

চিত্রকূটের পাশেই এক শিব মন্দির। দুই কারণে এই মন্দির মানুষের চোখ টানে। এক তো মন্দিরটাই এক কালো শিবলিঙ্গের রূপ, আর দ্বিতীয়তঃ মন্দির চত্বর থেকেও দেখা যায় ইন্দ্রাবতীর ঝাঁপ। পরিবেশের কারণেই এ' মন্দির অনন্য।

বৃষ্টির সম্ভাবনা আমাদের হাতে ছাতা ধরালেও ছাতা সে কখনই দেখার অন্তরায় হয় নি। বরং রোদের জ্বালায় জ্বলতে হয়নি বলে দিব্য চলে এসেছি 'তামড়া ঘুমর' জলপ্রপাতে। পথে পথেই দেখেছি মারদুম ভ্যালির শোভা। তারপর স্বাভাবিক পথ ছেড়ে মারিগুদা গ্রামের লাল কাদা রাস্তা আর ইউক্যালিপ্টাসের জঙ্গল পেরিয়ে গাড়ি যেখানে থামল সেখান থেকে ভিউ পয়েন্ট পর্যন্ত পুরো রাস্তাই পিচ্ছিল প্রস্তরময়। পায়ে পায়ে দীপক ভাইয়ের দেখানো পথে ভিউ পয়েন্ট পৌঁছাতেই যেন চমক খেলাম। তেমন ভাবে নাম না শোনা ইন্দ্রাবতীর এক ধারা বর্ষার জলে পরিপুষ্ট হয়ে সাধারণের চোখের আড়ালে এভাবে একশো ফুট ঝাঁপ দিয়েছে এ কল্পনাও করিনি। আর কি সবুজ প্রকৃতি! মিথ্যে কি আর এ স্থান ময়ূরের বিচরণক্ষেত্র? স্থানীয় লোকেরা তো একে তামড়া ঘুমর বলেনা, বলে ময়ূর ঝরণা। তামড়া ঘুমরের যে স্থানে এলাম সেটাও এক সবুজ রাজার রাজ্য। এর ভিউ পয়েন্টের কাছে অন্যসময়ে ধীরে চলা এক জলস্রোত হঠাৎই নির্ঝরিণী হয়ে উঠেছে বর্ষার সোহাগ পরশে। প্রকৃতপক্ষে এ শুধুই 'মেনদ্রি ঘুমর'। বর্ষায় তাঁর ৭০ ফুট গড়িয়ে নামা দেখে পর্যটকেরা নামের

শেষে জলপ্রপাত জুড়ে দিয়েছে। বর্ষাতেই যখন দেখছি তখন 'মেনদ্রি'কে জলপ্রপাত বলতে অসুবিধা কোথায়!

চলতে চলতে দেখা দেয় নজর কাড়া ইন্দ্রাবতী নদী। ব্রিজ থেকে নদীর যে বঙ্কিম ভঙ্গিমা, তাকে ক্যামেরা বন্দি করতেই হয়। নদী পার হলেই নারায়ণপাল গ্রাম আর সেখানে সহস্রাব্দ প্রাচীন বস্তার জেলার নারায়ণপাল বিষ্ণু মন্দির। ১১শ শতাব্দীর এই মন্দির ছিন্দক বংশীয় রাণী মুমুন্দাদেবী না নাগ বংশীয় রাজা জগদীশ ভূষণ স্থাপন করেন তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও চালুক্যশৈলী প্রভাবিত এ মন্দির যে খাজুরাহোর কথা মনে পড়ায় এটা বাস্তব। ঐতিহাসিকদের মতে এ মন্দির আদিতে ছিল ভোলানাথ শিবের। পরে গর্ভগৃহে রাখা হয় শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি। ইতিহাস যাই বলুক, ইন্দ্রাবতী আর নারঙ্গী নদীর সঙ্গম স্থলে নির্জন এই মন্দিরে যেন পাই ঈশ্বরলাভের আনন্দ!

ইন্দ্রাবতীকে আবার অতিক্রম করতে হয় 'চিত্রধারা' প্রপাত দেখার পথে। প্রপাত অবশ্য নামেই। ৫০ টাকার টিকিট কেটে কমবয়সিরা হয়তো পাথর টপকে নীচে নেমে গা ভেজাবার বিলাসিতায় মাততে পারে কিন্তু আমাদের মত সিনিয়র সিটিজেনকে তো সে চোখের দেখাও দেখতে দেয়না এই ভরা বরষায় ভিউপয়েন্ট থেকেও! ৫০ ফুট ঝরে পড়ার দৃশ্য যে শুধু ইউটিউবেই দেখতে হল- এটাই দুঃখের।

চিত্রধারা থেকে কাঙ্গের ভ্যালির পথে দেখা যায় বিশাল জনাশয়ে বর্ষার জল জমছে শুখা মরসুমের কথা ভেবে। জলাশয় ডাইনে পড়ে থাকে, আমরা এগিয়ে চলি দন্তেওয়ারার দিকে যতক্ষণ না এক তে'মাথার মোড়ে হায়দ্রাবাদ রোড (NH-30) এসে দেখা দেয়। সেখান থেকে বাঁয়ে মোচড় মেরে NH-30 ধরে খানিক চললেই

কাঙ্গের জঙ্গলের সীমানা। জঙ্গল দেখতে আসিনি, সেটা সম্ভবও নয় ১লা নভেম্বরের আগে, তবু এই জঙ্গলের পথ ধরেই চলতে হয় কাঙ্গের ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক পর্যন্ত- তার আগে যে তিরথগড় জলপ্রপাতের আভাস মাত্র মেলেনা। ন্যাশনাল পার্কের ঠিক উল্টোদিকে যেখানে একটা পথ হায়দ্রাবাদকে বিদায় দিয়ে ডাইনে ঘুরেছে একটু একলা চলার খেয়ালে, সেই আঁকাবাঁকা পথে চার কিলোমিটার চললেই ৫০ টাকার বিনিময়ে প্রপাতের কারপার্কিং। তাতেও অবশ্য প্রবেশাধিকার মেলেনা, চেকপোস্টের কাউন্টারে জনাপ্রতি আবার ৫০ টাকা দিলে তবেই মেলে প্রপাতের শেষতম ধাপে নেমে যাওয়ার সুযোগ। সিঁড়ির প্রথম ধাপের আগে ভাঙ্গা তোরনের পাশে ছয়টা বাঁদর যে ভাবে জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে আছে তাতে তাদের প্রপাতদ্বারের ঘুমন্ত প্রহরী ভাবলে ভুল হবেনা। ইতিমধ্যেই শুনতে পেয়েছি তিরথগড়ের প্রবল গর্জন। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখাও গেছে তার সোল্লাসে নেমে আসা। কিন্তু দুচোখ ভরে তাকে দেখতে হলে নামতে হয় অন্তত ১৫০টি ধাপ। কালো বিশাল পাথরের বুক বেয়ে সাদা ফেনার মত কাঙ্গের নদীর এক শাখা মুংবাহার যখন ১০০ ফুট গড়িয়ে নামছে, সে যেন কালো দৈত্যপুরীতে দেবসেনার তাণ্ডব অথবা স্বয়ং মহাদেবের তাণ্ডব লীলা এক কালাপাথর সাম্রাজ্যে! এখানেই শেষ নয়, তিরথগড়ের মোট ঝাঁপ ৩০০ ফুট দেখতে হলে ভাঙতে হবে আরও ১৫০ ধাপ। সেখানেই দেখতে পাবেন আছাড়ি পিছাড়ি মুংবাহার কেমন ছুটে চলেছে কাঙ্গেরের সাথে মিশে যাবে বলে।

আগামী কাল পায় পায় জগদলপুরের আগে এ দেখাই আমার অন্যতম সেরা পাওনা।

দন্তেশ্বরী মন্দির

কাঙ্গের ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক

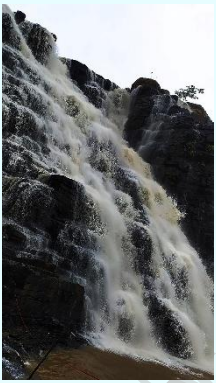

তিরথগড় জলপ্রপাত

বিষ্ণু মন্দির

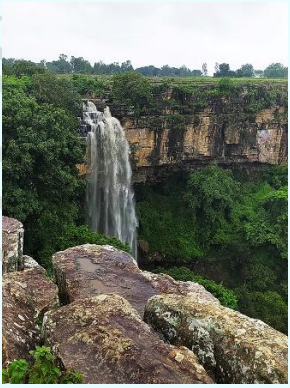

মেন্দ্রি ঘুমর

চিত্রকোট জলপ্রপাত

বাঁশের ভেলা পেয়েছিলাম একটা ,
চারিদিক থেকে জলের ঝাপটা মেরে
সেই ভেলাটাকে ডুবোতে চেয়েছিল নদী।
প্রাণপণে লড়াই করে সেই ভেলাটাকে বাঁচিয়েছি।
নদীর কিনারা ছুঁয়ে চলতে চলতে
কখন যে ভেলাটাকে নৌকা বানিয়েছি!
তাঁর উপর আমার সুখের সংসার,
মাথার উপর পাটাতনের ছাদ,
ছোট ছোট দরজা জানালাও আছে।
এই নৌকা প্রাসাদের আমি রাজমাতা।
এখন সেই ভেলাটার কথা কেউ জানে না –
কিন্তু আমি তাকে ভুলবো কি করে?
আমার জীবনের সুন্দর দিনগুলো দিয়ে
সেই ভেলাটাকে নৌকা প্রাসাদ তৈরি করেছি যে,
আজ যাদের সেই নৌকা প্রাসাদ উপহার দিলাম
তারা কি কখনো জানবে
ওটা তৈরি করতে গিয়ে
আমি কি কি হারিয়েছি?
আমি আমার জীবনটাকেই হারিয়ে দিয়েছি।
ভেবেছিলাম ওরাই আমার জীবনটাকে
আবার ফিরিয়ে এনে দেবে
হলেই বা অল্প সময়ের জন্য।
ভাবতে ভাবতে ভেসে চলেছি।

এমন সময় --
আগে যাবার পথ আটকে নদী বলল --
“আমার জলকর দাও”!
তখন কি জানতাম ওরা আমাকেই
নদীতে ফেলে দেবে অপ্রয়োজনীয় মনে করে।

হে অমিতাভ **শান্তশীল দাশ**

তোমার বাণী ভুলেছে আজ
ভুলেছে চারিধার,
তাই তো এই ধরণীবুকে
নেমেছে কী আঁধার!
হিংসা-দ্বেষ জর্জরিত
পৃথ্বী হ'ল আতঙ্কিত;
মানুষ-বেশ ধরেছে
যত ছদ্মবেশী মার'।
ঘুচাও এই অন্ধকার,
ঘুচাও তথাগত;
জীবন দাও মৃত্যুভীতে
অশুভে কর নত।
তোমার প্রেম মন্ত্র দানে
জাগাও ধরা আলোর গানে;
হে অমিতাভ, শরণ মাগি
চরণে আরবার।

আমার আশ্রয় **সুনন্দন ঘোষ**

সাত রঙের বিস্তৃত ভূখণ্ড আমার হৃদয়ে।
আড়াই হাজার বছর সেখানে চলছে যবনদের হানাদারী।
বারবার লুঠ হয়ে গেছে সোনার শিখর,
লুঠ হয়ে গেছে সোনার মেয়েরা।
রক্তের স্রোত বয়ে গেছে প্রাসাদ থেকে প্রান্তরে।

চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বারোহাজার রাজপুত সুন্দরী
জহর ব্রত করেছিলেন রাণী পদ্মিনীর সাথে।
খিলজীর কামাগ্নিকে রুখে দিয়েছিল জোহরের শিখা।
নিশ্চিহ্ন হয়েছিল ভগবান একলিঙ্গের দশহাজার দেওয়ানী ফৌজ ।

আমরা দেখি, বুঝি না; উলটোই না ইতিহাসের পাতা।
অব্দ থেকে শতাব্দ ..... সহস্রাব্দ ...
বানানো গল্পকে ইতিহাস ভেবে দাসত্ব করেছি যবনের জয়ধ্বনি দিয়ে।

সময়ের জলস্রোতে ধুয়ে গেলো মায়ার কাজল।
উন্মাদিনীর নির্মম শাসন, জিহাদির অন্তর্ঘাত,
সীমানার ওপারে এপারে রক্তের স্রোত।
হাজার বছরের গ্লানি কাটিয়ে প্রত্যাঘাতের শপথ
ছড়িয়ে গেলো সনাতনী ধমনীতে।

রক্তস্রোতের মধ্যেই জেগে উঠেছে আমার আশ্রয় --
তিরঙ্গায় মোড়া
আমার একমাত্র ভালোবাসা।